মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোঃ আশরাফুল ইসলাম *

একান্তভাবেই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিভূ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬) মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও সম্ভাবনাকে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পীভাবনা ও মধ্যবিত্ত চেতনার সঙ্গে পরিপূরক হয়েই বিকশিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজবাদী রাজনৈতিক বোধ। *চিহ্ন* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজবাদী রাজনৈতিক চেতনার শিল্পরূপ। আলোচ্য উপন্যাসেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট স্ফুরণ ঘটেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়, আর *চিহ্নের* প্রকাশকাল ১৯৪৭ । দু'টি উপন্যাসের প্রকাশগত এই দূরত্ব বা ব্যবধান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ ও শিল্পবোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাছাড়া ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। সুতরাং *চিহ্ন* উপন্যাসটি হঠাৎ করেই রচিত হয়নি, সূচনারও সূচনা থাকে। তাই *চিহ্ন* উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ এবং শিল্পদৃষ্টির পরিবর্তনগুলো সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করবো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত সৃষ্টির পর্যালোচনা করে আমরা তাঁর শিল্পবোধের স্বরূপকে নিম্নোক্ত তিনটি সূত্র দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি;

(ক) ফ্রয়েডীয় জীবন জিজ্ঞাসা

(খ) মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক জীবনদৃষ্টি এবং

(গ) নান্দনিক দৃষ্টিকোণ।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিজ্ঞানমনস্ক মানিক যে কোনো বিষয়, যত দুরূহই হোক নিত্য-নতুন পরীক্ষার দুর্বহ ক্লেশ স্বীকার করতেন। শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। নির্মোহ গাণিতিক বুদ্ধি দিয়ে সেই অভিজ্ঞতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন একের পর এক নানা সমস্যা। রোমান্টিক ভাবালুতার প্রতি চরম বিরূপতা নিয়ে জাত বৈজ্ঞানিকের মত সেই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন তিনি বাংলা সাহিত্যে। একের পর এক জীবনসত্যকে তিনি উন্মোচিত করেছেন। ফ্রয়েডীয় জীবনজিজ্ঞাসা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষের জটিল ও নিষিদ্ধ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে। অতঃপর মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ তাঁকে নিয়ে গেছে নিঃস্ব মেহনতি মানুষের কাছে। তাদের জীবনের বাস্তবতায় তিনি ক্ষুব্ধ। জীবনজয়ী সাধনায় তিনি যুক্ত হলেন শোষিত নিপীড়িত মানুষের গণ-অভ্যুত্থানে। জীবন ও প্রতিভার পরিপূর্ণতার সন্ধান পেলেন সেখানে। উত্তর-চল্লিশের ব্যাপক ছাত্র কৃষক-শ্রমিক বিক্ষোভে তাঁর লেখনি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী জীবন ও ঘটনাকে রসোত্তীর্ণতার চরম শিখরে তুলে বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন পথের নির্দেশ দিলেন। ইচ্ছা–অনিচ্ছার বাইরেও যে সত্য অবশ্যম্ভাবী সেই সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন বাংলার পথে-প্রান্তরে-কলে কারখানায়। এক্ষেত্রে তাঁর মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক জীবনদৃষ্টি গভীর প্রভাব ফেলেছে। আর এ সময়েই তিনি রচনা করেছেন তাঁর অসাধারণ শিল্পসফল *চিহ্ন* উপন্যাসখানি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় সাহিত্যচর্চা করেছেন সে সময় বাংলা সাহিত্যে নান্দনিকতার উৎকর্ষের কাল চলছে। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪) এবং প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) 'চার ইয়ারি কথা' (১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছে যেখানে উভয়েই গঠন-কৌশলরীতি, শব্দ ও ভাষার ব্যবহার নিয়ে নানামাত্রিক পরীক্ষা করেছেন।

চিহ্ন উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে সংঘটিত আন্দোলনের নানা ঘটনা হলেও উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলির সঙ্গে ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় সংঘটিত ঘটনাবর্তের মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই সময়ের প্রধান ঘটনাগুলো সম্পর্কে পত্রিকা থেকে যা জানা যায় তার সারকথা নিম্নরূপঃ ২১ নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলার মোড়ে ছাত্রদের মিছিল পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে রাতব্যাপী ছাত্ররা সেখানে অবস্থান ধর্মঘট করে। অবস্থানকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের মাড়ানো প্রভৃতি সত্ত্বেও তাদের অবস্থান অব্যাহত থাকে। গুলিতে ছাত্র রমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হন। পুলিশের লাঠিতে থেতলে যায় দশ বছরের একটি কিশোরের মাথা। গুলিবিদ্ধ হাত নিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে ইট নিয়ে আক্রমণোদ্যত

হয় এক যুবক। কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নাম করে কিরণ বাবু ছাত্রদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পাঠালে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। জোতির্ময়ী গাঙ্গুলি শরৎচন্দ্র বসুর নিকট ছুটে গিয়ে ফিরে এসে জানান, তিনি আসবেন না। ২২নভেম্বর কলকাতার মানুষের ঢল নামে ধর্মতলার মোড়ে। ট্রাম বাস বন্ধ থাকে ইউনিয়নের নির্দেশে। তবু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। পুত্র অমিয়নাথ ও বন্ধু সুরেশ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ বসু সে সভায় উপস্থিত হন এবং সকলকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন; কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। ধর্মতলা স্ট্রীটে আবার গুলির খবর শুনে সেখানে বাধভাঙ্গা মিছিল ছুটে যায়। অপর দিক থেকেও মিছিল এগিয়ে এলে পুলিশ বাধ্য হয়ে স্থানত্যাগ করে। এভাবে মিছিল সমাবেশের জন্য নিষিদ্ধ লালদিঘির রাস্তা জনতার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ২৩ নভেম্বরও জনতার প্রতিবাদ বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। সরকার বাধ্য হন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নায়কের দণ্ড মওকুফ করতে। তিন দিনে কলকাতায় চৌদ্দটি গুলিবর্ষণের ঘটনায় তেত্রিশ জন প্রাণ হারায়।[২]

রাজনৈতিক এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমরা *চিহ্নের* ঘটনার যে সাযুজ্য লক্ষ করি তা নিম্নরূপ।

প্রথমত, ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েও উপন্যাসের একটি চরিত্র রসুলের মিছিলে থেকে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের জাতীয়তাবাদী নেতা বসন্ত রায় নিজে আসেনি সমাবেশস্থলে বরং তার সহকারী অমৃত মজুমদারকে পাঠায় ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে কিন্তু তার সে পাঠানো নির্দেশ অগ্রাহ্য হয় ছাত্র জনতা কর্তৃক।

তৃতীয়ত, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তেত্রিশজন মৃত্যুসংবাদের বিপরীতে চিহ্নে দুটি মৃত্যুর (গণেশ ও জয়ন্ত) ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় সংঘটিত ঘটনাবর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে ঔপন্যাসিক মূলত ১৯৪৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারির অধিকতর সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা দ্বারাই গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা সে দিনের ঘটনাবলি স্মরণ করতে পারি।

তিন দলের (কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির) তিনটি পতাকা সামনে নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা লালদিঘির মোড় অতিক্রমণের কিংবা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করার নির্দেশ অমান্য করায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পথচারীকে ধাক্কা মেরে

ফেলে দেয়ার যে চিত্র অংকিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে, তার সাথে ১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারি মাসে রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে সংঘটিত আন্দোলনের সাযুজ্যই সর্বাধিক। ২২ নভেম্বর ১৯৪৫ সালেও বিরাট শোভাযাত্রা রাজপথ প্রকম্পিত করে এবং তাতে উপর্যুক্ত তিনটি রাজনৈতিক দলের পতাকাও ছিল। তবে সেখানে শৃঙ্খলার কমতি ছিল। কিন্তু ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালের শোভাযাত্রা ছিল সংগঠিত ও অধিকতর সুশৃঙ্খল এবং নভেম্বরের চেয়ে ফেব্রুয়ারিতে তিন দলের ঐক্যের মনোভাব স্পষ্ট ছিল। আবার সেনাবাহিনী কর্তৃক পথচারীদের দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করার ঘটনা পুরোপুরিভাবেই ১৯৪৬ সালের ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারির।[৩] এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হলে সেনাবাহিনীর নির্দেশ অমান্য করে তাদের দ্বারা নিগৃহীত হন যার বিবরণ আমরা অমলেন্দু সেনগুপ্তের রচনায় পাই।[৪] সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাস ১৯৪৫ সালের ঘটনাকে পটভূমি করে রচিত হলেও এতে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালের উত্তাল প্রসঙ্গগুলির স্পষ্ট আভাস এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বর্তমান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে পরিভ্রমণে ফ্রয়েডীয় জীবন জিজ্ঞাসা এবং মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক জীবনদৃষ্টির ভূমিকা দূরসঞ্চারী। তা সত্ত্বেও নির্ধারিত আদর্শের ফ্রেমবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনের নানামাত্রিক বৈচিত্র্যকে অনুধাবনের চেষ্টা করেননি, বরং জীবনযন্ত্রণার চলমান নানা তত্ত্বকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। একটি রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব যে কত সুদূর প্রসারী, কত বিচিত্র, বিস্তৃত ও ব্যাপক হতে পারে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণে *চিহ্ন* উপন্যাস সমগ্রতা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট একত্র হয়ে অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ ঘৃণা, ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র জনতার বিদ্রোহ, সাহস ও শক্তিকে প্রকৃত শিল্পীর মেজাজ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই তিনি সংগ্রামশীল মানুষের মধ্যে সকল সম্ভাবনার বীজ দেখতে পেয়েছেন। মৃত্যু মুহূর্তেও চিহ্ন উপন্যাসের গণেশ ভগবানকে স্মরণ করার পরিবর্তে অবস্থানরত ছাত্র মিছিল অগ্রসর হবে কিনা সেই প্রশ্ন রেখে যায়। ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রসূল অদৃষ্টকে দায়ী না করে এক হাত দিয়ে সাইকেল চালনাসহ সকল কাজ কিভাবে রপ্ত করবে সেই কথা ভাবে। একমাত্র পুত্রকে হারিয়েও শ্রমিক ওসমান পুত্রবন্ধুদের মধ্যে নিজপুত্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মৃত্যুভীতি, পারিবারিক সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা প্রভৃতি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। কিন্তু সামষ্টিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ আর সংকীর্ণ স্বার্থ সীমায় আবদ্ধ থাকে না। সমষ্টির সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। চিহ্ন উপন্যাসে রজত

বলে- আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক।[৫] আবদুল ও রসুল উভয়ের একই অনুভূতি, আঘাতের বেদনা ও মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। শিবনাথ তাই বলে- রসুল আমার ভায়ের মতো। (৬/৯২) এভাবে শ্রেণী নির্বিশেষে একীভূত অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘশক্তির উত্থানেই মানব মুক্তি সম্ভব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গণসংগ্রামের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে এর স্বরূপকেই আঁকতে চেয়েছেন। বাস্তব সত্যকে শিল্পসত্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনা ও প্রতিভা শক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ ও সামাজিক অভিজ্ঞতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। আর্থিক অনটনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করেছি সমসাময়িক উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনাবলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাজগতে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৯৪৭ সালেই কানপুরে, ৪০,০০০ শ্রমিক টানা ১২০ দিন ধর্মঘট পালন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা-চেতনা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। *চিহ্ন* রচনার পূর্বে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮) উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁজিকে একটি শক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন যার লাভ-চেতনা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত বা অমানুষ করে তুলতে ঐতিহাসিকভাবে সাহায্য করে।

১৯৩৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় 'লিবিডো তত্ত্ব' প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক, সঙ্ঘশক্তি পুঁজি প্রভৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি অনুধাবন করেন, প্রজনন নয়, অস্তিত্ব রক্ষার আগ্রহ বা বৃত্তি অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি পরে এও বুঝেছিলেন যে, এ কাজ একা করা সম্ভব নয়। একা একা আত্মরক্ষা করা বা বেঁচে থাকা যায় না, সাময়িকভাবে টিকে থাকা হয়তো বা সম্ভব। সুতরাং সুসংগঠিত শাসনের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হলে সুসংগঠিত বা সুসংহত সংগঠন থাকা দরকার। আর *চিহ্ন* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বোধেরই উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন। শ্রমিক-বেকার-ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর (উচ্চ ও নিম্ন উভয়ই) সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং এ সম্মিলিত শক্তি যদি বিদ্রোহ করে তাহলেই দ্বিমুখী মুক্তি (পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক) অর্জন সম্ভব— এ বিশ্বাসে পৌঁছেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার *চিহ্ন* উপন্যাসখানি রচনা করেন।

চিহ্ন উপন্যাসের নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে এর বিষয়বস্তু বিবেচনা প্রয়োজন। দুদিনেরও কম *চিহ্ন* উপন্যাসের ঘটনাকাল। একদিন দুপুর থেকে পরদিন দুপুর এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাহিনী বিস্তৃত। রাজপথে যুবকদের অবস্থান ধর্মঘট, অবস্থানরতদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, ঘোড়সওয়ার পুলিশের হামলা, গুলিবর্ষণ

প্রভৃতি সত্ত্বেও তাদের অনড়তা, গুলিবিদ্ধ হয়ে বহু হতাহত হওয়া, হাসপাতালে আহতদের গ্রেপ্তার, জাতীয়তাবাদী নেতার গৃহপ্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশ অবস্থানকারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান, ট্রাম চলাচল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ ইত্যাদি ঘটনার পরদিন প্রতিবাদসভা, শোভাযাত্রা, ট্রাম-বাস ধর্মঘট, আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের একাত্মতা, পথচারীদের দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল সাফ করানোর জন্য সৈন্যদের প্রচেষ্টা এবং অবশেষে মানুষের বাধভাঙা ঢলের কাছে পুলিশ প্রশাসনের পিছু হটার মধ্য দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত হয়। রাজপথের এই ঘটনার বাইরে মন্বন্তরের সময় নিজ গ্রামে ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে একজন কলেজ ছাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি, সমসাময়িককালে শাসক প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো এক কৃষক কন্যার সম্ভ্রমহানির উদ্যোগের বিরুদ্ধে কৃষকদের জোটবদ্ধ প্রয়াসের দুটি সংক্ষিপ্ত অনুকাহিনী; অবৈধ ব্যবসায়ী এবং উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ ও তার পরিবারের কাহিনী আছে।

উপর্যুক্ত এই বিক্ষিপ্ত, বিশ্লিষ্ট, টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে *চিহ্ন* উপন্যাস রচিত। এতদসত্ত্বেও সমসাময়িক সামাজিক আলোড়ন বা ঘটনাবলি তথা সমাজসত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলেই *চিহ্নের* জন্ম। একই পটভূমিকা নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (নভেম্বর ১৯৪৬)[৬] রচনা করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিল্পসফলতা লাভ করতে সক্ষম হননি। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে উদ্ধৃত করছি প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ ঃ

শিল্পীকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সে জনসাধারণের বন্ধু না হলেও জনসাধারণই তার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। কাজেই মিথ্যা অহমিকার মোহে গণ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন লাভ নেই। বরং জনতার সাথে একাত্ম হতে পারলেই সর্বাঙ্গীণ শুভ। মানুষ ভালবাসে সেই শিল্পীকে যে প্রকৃত দরদ দিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে তার শিল্পে।[৭]

এক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকভাবেই জনসাধারণের জীবনসত্য ও জীবনের সমগ্রতাকে *চিহ্নে* ধারণ করেছেন।

মানুষ যখন কথা বলে সে একা কথা বলে না, তার মধ্যে কিছু 'Context' থাকে। এক বা একাধিক 'Context' যুক্ত হলে মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্ব দিয়ে মানুষকে, জীবনকে বিবেচনা করেননি। তবে জীবনকে অনুভবের জন্য, জীবনকে দেখতে গিয়ে, বুঝতে গিয়ে একের পর এক তত্ত্বে পৌঁছেছেন। সমাজ অনুধাবনে তিনি দু'টো মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন। যথা :

(ক) 'পুঁজি' কীভাবে মানুষকে পরিচালনা করে।

(খ) লিবিডো কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ-দুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবনদর্শন। এই ত্রি-মাত্রিকবোধ দ্বারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা আত্মীকৃত হয়ে ওঠে।

চিহ্নে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে আস্থাশীলতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলাম। সঙ্ঘশক্তির জাগরণকে শিল্পিত করে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককেই লেখক উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে শ্রেণী সংঘর্ষজাত কাহিনী, জীবনাংশ, ঘটনাংশ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা বাস করা যায় না— এ বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে পাওয়া। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করে যারা সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না— তারা পচনশীলতায় নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু *চিহ্নতে* সম্পূর্ণ ভিন্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাই আমরা। এখানে তাঁর নতুনমাত্রিক হয়ে উঠার ইতিহাস আছে। প্রথম থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অস্তিত্ব, আবেগ, সংগ্রাম, অন্তর্জগত, বহির্জগতের সমস্যা সবকিছুকে বিশ্লেষণ করার শৈল্পিক-বৃত্তি অর্জন করেছেন। কৈশোর থেকেই তাঁর প্রজ্ঞা গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে শোষণের কারণ, মানববৃত্তি ইত্যাদি জেনেছেন, পাঠ করেছেন সমাজকে।

চিহ্ন উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ বলা যায়। আদি, মধ্য ও অন্তে বিন্যস্ত হয়ে কোনো একটি বা দু'টি মানুষ বা পরিবারের কাহিনী এ উপন্যাসে গতিবান হয়ে উঠেনি এবং নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বনায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলি আবর্তিত ও পল্লবিত হয়নি। রাজপথই প্রকৃতপক্ষে *চিহ্ন* উপন্যাসের নায়ক। রাজপথের রাজনৈতিক সংগ্রামই *চিহ্ন* উপন্যাসের প্লট রচনা করেছে। একটি চলমান চক্ষু-লেন্স যেন এই সংগ্রামের নানা টুকরো চিত্র ধারণ করে উপন্যাসের কাহিনীকে সমগ্রতা দান করেছে।

নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্ন* উপন্যাসে প্রথাবিমুক্ত ও স্বতন্ত্র পথস্রষ্টা। কোলাজধর্মিতা (Collage) উপন্যাসটিতে লক্ষণীয়। উপন্যাসটির সূচনাতেই দেখি :

> প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের। বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ঘটনা, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনিভাবে তার চেতনাকে গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সে-ই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। (৬/৫৭)

— একটি সঙ্ঘপ্রতিবাদের প্রতীক। বিপুল অবস্থানটিকে প্রতীকী তাৎপর্যে এভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'সে-ই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে'— এই বাক্যে অবস্থানটির ব্যাপকতা, গভীরতা ও ধাক্কা জনজীবনে ও চৈতন্যে কিরূপে কার্যকর হয়েছে তা গণেশের মত সাধারণ মানুষের প্রতীকে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষের চেতনাকে গণেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্নাটকীয় রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই উপন্যাসের সূচনা এরকম আকস্মিক। *চিহ্ন* উপন্যাসের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এর কাহিনীগতির কথাও মনে রাখা প্রাসঙ্গিক। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে যখন ঐতিহাসিক কিংবা বড়ো ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন পরিবর্তনগুলোও আসে দ্রুতগতিতে। এ ধরনের ঘটনাকে উপন্যাসে ভাষারূপ দিতে গেলে এর কাহিনীতে দ্রুতগতি আনা জরুরি হয়ে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিহ্ন* উপন্যাস উপর্যুক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। রাজপথের একটি সাহসী সংগ্রাম যা কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে— উপন্যাসে সে- বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের জন্য ঔপন্যাসিকের সামনে দ্রুতগতি সৃষ্টির বিকল্প ছিল না। তাই উপন্যাসে আমরা দ্রুতগতি, কাহিনী গতি ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জনের প্রয়াস লক্ষ করি।

ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিচিত্র জীবনসমস্যার সমগ্রতার সন্ধান করা।[৮] উপন্যাসের শিল্পরূপ- সম্পর্কিত সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন,- "...ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড়ো বিষয় হল জীবনের সমগ্রতার সন্ধান। ...এই সন্ধানের সার্থকতার রূপ তখনই সৃজন করা যায়, যখন উপন্যাস-কারের নির্ভীক নিরাসক্তি জীবন সন্ধানে লেখককে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করে তোলে ... এ নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিন্তু বাস্তবের স্থূল অতি বর্ণনা নয়। ....সামগ্রিকতা মানে totality of objects এবং totality of objects মানে Cataloguing of details নয়; নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এইটা প্রধান কথা।"[৯]

উপন্যাসের নান্দনিক সফলতার জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে জীবনের সামগ্রিকতা সন্ধান *চিহ্ন* উপন্যাসে কীভাবে এসেছে তা আমরা এখন দেখবো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত উপন্যাসরীতির মতো কোনো একটি পরিবার বা ব্যক্তিকে তাঁর *চিহ্নে* প্রধান করে তোলেননি; বরং নানা টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়ে তিনি মূল বিষয়কে সম্পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন। তাই এখানে এত বিচিত্র প্রসঙ্গ

ও কাহিনী আসা সত্ত্বেও এর Totality of objects অক্ষুণ্ণই রয়েছে। সর্বোপরি Unity of impression : (বোধের ঐক্য) এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আনতে সক্ষম হয়েছেন যা বাংলা উপন্যাস শাখায় নতুন এবং এ বৈশিষ্ট্য উপন্যাসটিকে 'Totality' দান করেছে নিঃসন্দেহে।

উপন্যাসটির কাহিনী ও বিষয়ের সঙ্গে এর নান্দনিক শৈলীর অপূর্ব সমন্বয় প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীর নানামাত্রিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা পরিচর্যারীতির ব্যবহার করে দুটোকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। আন্দোলন চলাকালীন জনতার ঐক্যবদ্ধতাকে নিম্নোক্ত প্রতীকী ব্যঞ্জনার সাহায্যে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে : 'হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীরস্থির হয়, বন্দুকধারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না।" (৬/৫৭)

লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণরীতি থেকে রচিত *চিহ্ন* উপন্যাসের ঘটনা নির্মেদ, চরিত্র স্বল্পরেখা ও স্বল্পচিত্রে উপস্থাপিত। চরিত্রসমূহ চিত্রাত্মক ও দৃশ্যাত্মক পরিচর্যা, চিত্রকল্পময়, প্রতীকী, ঈষৎ নাটকীয় এবং উল্লম্ফনধর্মিতার 'Cut to Cut' প্রক্রিয়ায় রূপায়িত। চরিত্রের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই। প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রের দৃষ্টিকোণও ব্যবহৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। হেমন্তর বিপ্রতীপ, প্রাগ্রসর বৈশিষ্ট্য ও উল্লম্ফনধর্মিতা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত। উপন্যাসের সকল চরিত্রের রূপ-রূপান্তর মূলত চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই রূপায়িত।

উপন্যাসে কেন্দ্রীয়, মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র— সব মিলিয়ে ষাটের মত। যদিও কোন একটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই আশ্চর্য জীবন্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে গেঁথে যায়। সমগ্র উপন্যাসে তাদের উপস্থিতি কিছুক্ষণ বটে তবে তারা প্রত্যেকেই স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। উপন্যাসের গণেশ, ওসমান, জিওনলাল, হেমন্ত, শুদ্ধসত্ত, আনোয়ার, শিবনাথ, সীতা, পঙ্কজ, নারায়ণ, রসুল, আব্দুল, চিরবাগী গাঁয়ের জমিদার শ্রীচপলাকান্ত বসু, জিয়াউদ্দীন, বসন্ত রায়, অমৃতবাবু, অক্ষয়, অলকা/মেনকা, মাখন সরলবাবু, রাম সিং, মনমোহন, সুধা, রাখাল, অমৃত মজুমদার, অরুণা মজুমদার, বীণা, হালিম, সুব্রত, অজয়, মাধু, যাদব, রাণী, সুধীর, পদী, কেশব, এল ক্যামারণ, হাবিবের বাপ, অনুরূপা, জয়ন্ত, রমা, শান্তা, নকুল, আমিনা, সুধাই, ললিতা, এন. দাসগুপ্ত, চন্দর, ম্যাকারণ, ঘোষ সাহেব, খলিল, রেজ্জাক, হানিফ, বুধুলাল, পরীবাণু, কাদের, শিশির, মনা, অনন্ত এবং নির ন— এরা প্রত্যেকেই আন্দোলনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে উপন্যাসে এদের আগমন কখনোই অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। ব্যক্তি মন ও সমাজ

সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্ন* উপন্যাসে চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছেন। *চিহ্নতে* অনেকগুলো পরিবারের চিত্র অঙ্কনের ফলে বহু চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি চরিত্রের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত যত্ন ও শৈল্পিক সহানুভূতির সঙ্গে উন্মোচন করা হয়েছে। উপন্যাসের পরিণামী ব্যঞ্জনার সঙ্গে একাত্ম হয়েই সকল চরিত্র উপস্থাপিত। প্রতিটি চরিত্রের আচার-আচরণ কিংবা তাদের আভ্যন্তর পরিবর্তনের সূত্রগুলো পূর্বাপর যুক্তিপরম্পরায় গ্রথিত। *চিহ্ন* উপন্যাসে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবর্গ, শ্রমজীবী— এই সকল শ্রেণীস্তরের চরিত্রের সমাহার ঘটিয়ে আন্দোলনের ব্যাপকতার স্পন্দনকে সম্পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।

উপন্যাস শুরুর বর্ণনা আমরা পূর্বেই দিয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপমার পর উপমা নির্মাণ করে আন্দোলনের স্বরূপটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। নদী-সমুদ্রের জোয়ারের রূপকে জনগণের জোয়ারকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক :

> এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে।
>
> ... দিনে ভাটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমির রোদ পোহায়। দেখে মনে হয় কত যেন নিরীহ ভাল মানুষ জীব। অল্প জলে হঠাৎ তীরের মতো কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্ব রেখায় কেটে হাঙর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত অদ্ভুত রকমের মাছ। (৬/৫৭)

এর পরে ঔপন্যাসিক যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন তার মধ্যেই উপন্যাসের মূল থিমটি প্রতিষ্ঠিত—

> আহা দুঃখী নদী গো, হাঙর কুমির মাছ মিলে কত জীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে বাঁয়ে যত দূর তাকাও তত দূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনিভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। (৬/৫৭)

ভাঙা ও গড়ার প্রতীক দেবতা শিবঠাকুরের উল্লেখেই মানিকের অন্বিষ্ট অনুধাবন করা যায়।

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি গণেশ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিজেই ভিড়ে পরিণত হয়ে জিজ্ঞেস করছে, "এরা এগোবে না বাবু?" এই জিজ্ঞাসাটি উপন্যাসে বহুবার এসেছে। মূলত এ জিজ্ঞাসাই উপন্যাসের মূল বিষয় যা সমগ্র উপন্যাস জুড়ে

অন্তরালবর্তী সুরের মতো যেন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উপন্যাসের শেষে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেছে—

> যাদব শুনতে পায় সে (অজয়) নিজের মনে বলছে : আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি। (৬/১৩৪)

এভাবে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সঙ্গে জ্যামিতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। টানটান ধনুকের জ্যা-এর মতো। গণেশ যে প্রাণের জোয়ার চেয়েছিল তা সে দেখে যেতে পারেনি। এও যেন একটা রূপক। সঙ্ঘশক্তির ঐক্যবদ্ধতার ফলে যে উত্তরণ তাই গণেশের বাবা যাদবের মনে হচ্ছে :

> "বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।" (৬/১৩৪)

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াচ্ছন্ন, অমীমাংসিত চরিত্রগুলির প্রতিনিধি হেমন্ত। কিন্তু বৃহৎ ডাকে সে-ও আন্দোলিত, আলোড়িত হয়। তার মনেও এ জিজ্ঞাসার উদয় হয় :

> সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাইনি। এটা তবে কিরকম ব্যাপার হল? (৬/৫৯)

যে হেমন্ত কতগুলো স্থির বিশ্বাসে জীবনকে পরিচালনা করেছে এতদিন, তার আজ সব কিছু বিশৃঙ্খল, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই সে ভাবছে :

> একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে।–হেমন্তের মনোজগত ও বহির্জগতের বিরাট পরিবর্তনই এই ভাবনার উৎস। (৬/৬২)

ঘটনা, কাল, পরিস্থিতি এবং পরিপ্রেক্ষিত মানুষের মধ্যে যে কি ব্যাপক পরিবর্তন আনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর রজতের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সে কথাটিই বলেছেন। স্বাভাবিক কোন পরিস্থিতিতে রজতের কথাগুলো আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে বাধ্য করে সময় সময় তার দাবি মেটাতে। সে দাবি মেটাতেই কিশোর রজত অভিজ্ঞজনের মতো পরিণত চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রাখে তার বক্তব্যে :

১. করে তো, সবারই ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো হয় না? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি। (৬/৬৬)

২. আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। (৬/৬৬)

এরপর আসে রসূলের প্রসঙ্গ। ঔপন্যাসিক অবস্থানটির মধ্যে কেন্দ্রীয় সমাজের যে 'মিনিয়েচার' নির্মাণ করেছেন তাতে প্রায় সব শ্রেণী ও স্তর উপন্যাসের সংগঠনে

অঙ্গীভূত হয়েছে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র যে শোষণ, শাসন ও অত্যাচার, কালোবাজারি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, জমিদারশ্রেণীর অত্যাচার এবং বিপরীতে . মানুষের লড়াই-সংগ্রাম তা এখানে অবস্থান ও অবস্থানধর্মী ঘটনার সাদৃশ্যে রসুলের স্মৃতির ভাবনায় অতীত প্রক্ষেপণ (Flash back) পদ্ধতিতে উঠে এসেছে। অবস্থানের সামনে বসে "আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠিচার্জ হবে।" (৬/৬৮) তার মনে পড়ে "দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল," (৬/৬৮) কয়েকজনকে হলেও বাঁচানোর লক্ষ্যে। হিন্দু জমিদার রিলিফ সেন্টার খুলতে বাধা দেয়। খিচুড়ি বিতরণের আগের দিন লালপাগড়ীর লাঠির আঘাতে তার কপাল ফাঁক হয়। হিন্দু জমিদারের কৌশলটি আবার অভিনব :

> গাঁয়ের শতকরা আশি জন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুল ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন— শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।" (৬/৬৮)

লাল পাগড়ির সেই 'আক্রোশ', 'বীভৎস হিংসা', রসুল ভুলে নি। তার মনে লাল পাগড়ির "সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ" এখনো আঁকা রয়েছে।

> উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলতার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রসুলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে। রসুলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথার সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে, তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা। (৬/৯৯)

এক গভীর চেতনার সমন্বয় ও অমোঘ প্রত্যয় নিয়ে কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রসুল ও আবদুল চরিত্রদুটি অঙ্কন করেছেন। তারা জানে, তারা আজ একা নয়। আঘাতের বেদনা কিংবা মৃত্যুজনিত শোক, তাপ সকলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তাই লাঠিচার্জ ও গুলির পরে রসুল যখন ডানহাতে গুলিবিদ্ধ হয় তখন এ নিয়ে সে মোটেও ভাবিত হয় না। বরং এক হাতে কিভাবে সাইকেল চালনা রপ্ত করা যায় সে কথা ভাবে :

রসুল বলে চলে, 'বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু—' (৬/৭২)

অক্ষয় চরিত্রটি আলোচনার পূর্বে বিষ্ণুদের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। *চিহ্ন* পড়ে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

'চিহ্ন' পড়ে মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। কলাকৌশলে যে তাঁর পরীক্ষার বিশ্রাম নেই, তার প্রমাণ 'চিহ্ন'। এই সিনেমাশোভন বহু ব্যক্তির জীবনে অবলম্বিত একটি কাহিনী এই রকম সামাজিক রূপ পায়নি ভার্জিনিয়া উলফে, বা হেনরি গ্রীনের চলন্ত গল্পে। তার কারণ অবশ্যই মানিকবাবুর সামাজিক অবহিতি এবং বাস্তব ঘটনার সুযোগ। বিপ্লবী রোমাণ্টিক দৃষ্টিতে কলকাতার একটি স্মরণীয় রূপ মূর্তি পেল কলকাতার কয়েকটি মানুষের জীবনের প্রবল আন্দোলনে স্থির সমকোণে নয়, ঘূর্ণায়মান চক্রে প্রগতিতে। যার সূত্রপাত অক্ষয় চরিত্রে। এমনি সততা মানিকবাবুর শিল্পীমনের, এমনি পরিমিত তাঁর রোমাণ্টিক আবেগ যে তাঁর দরদ স্বভাবতই পড়ে এই চরিত্রে, তার মানবিক পরিবর্তনে। সে পরিবর্তনে যে চূড়ান্ত ক্রান্তির চিহ্ন নেই, সেই তাঁর সামাজিক সততার প্রমাণ। ফেব্রুয়ারি- জুলাই- মে- আগষ্টে, সেই বর্ষভোগ্য আগস্টই তো মুক্তি পায় আরেক আগস্টে চোদ্দই পনেরোই অদ্ভুত আনন্দের *চিহ্নে*।[১৯]

শিল্পীত, প্রাগ্রসর, বিশ্বসাহিত্যমানের উপন্যাস 'চিহ্নে'র অক্ষয় চরিত্রটি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অমর সৃষ্টি। এ চরিত্রের রূপ-রূপান্তরের মধ্যেই উপন্যাসটির মূল বক্তব্য নিহিত। চাকুরিজীবী অক্ষয়ের নিত্য দিনের অভ্যাস মদ্যপান করা। অক্ষয়ের মা কিংবা স্ত্রী সুধার (সুধার আরও একটি নাম হচ্ছে অলকা। এ নামকরণ প্রতীকী। একজন মদ্যপায়ী অলীক জগতে অবগাহন করে। মদ্যপ অবস্থায় সে যে কোনো স্থানেই অবগাহন করতে পারে। সে যেতে পারে অলকাতে কিংবা যেতে পারে সুধায়। তাই অক্ষয়ের স্ত্রীর এমন নামকরণ করা হয়েছে।) শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে তার এ বদভ্যাস ত্যাগ করেনি। কিন্তু সময় একটি বিরাট উপাদান। সময়ের ঘূর্ণায়মানতার প্রভাব মানুষের মধ্যেও পড়ে। অনুরূপভাবেই, সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব পড়েছে অক্ষয়ের উপর দারুণভাবে। তাই আন্দোলন চলাকালীন মহাত্যাগ থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়নি। আন্দোলনে অক্ষয়ের সম্পৃক্ততার স্বরূপ তার মনোভাবনায় ফুটে উঠেছে। এভাবে :

তবে ওরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে। বাড়ী পৌঁছানো পর্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়ীতে বাকী রাত তার কাটবে লেপের নীচে। ওরা খোলা আকাশের নীচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি একজনেরও শীতের একটু লাঘব হয়। (৬/৭৮)

শুধু তাই নয়, সঙ্ঘশক্তির বিকিরণ নানা শ্রেণীর মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে, তাই তারা আজ একটু ব্যতিক্রম, অন্যদিনের মত নয়। দু'দিন রাজপথে ছাত্র যুবকদের মরণপণ সংগ্রামের নেশা প্রত্যক্ষ করে অক্ষয় নিজের মদের নেশার কথা

ভুলে যায়। সে অবস্থানকারীদের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পারে না। সঙ্ঘশক্তির জাগরণ অক্ষয়কে নতুন নেশায় উদ্দীপিত করে। অক্ষয়ের এই পরিবর্তন তার মনোজগতের বিচিত্র ভাবনাস্রোতে এভাবে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন :

ক. কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু'একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু'একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীবন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে— গেঁজানো রক্ত। (৬/১০৮)

খ. 'কিন্তু তখনো ভাবচি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা? (৬/১০৯)

গ. একদিন না খেলে কি হয়? (৬/১১০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ের মধ্যে আমরা অক্ষয় চরিত্রের যে রূপ রূপান্তর লক্ষ করি তাই উপন্যাসের মূল সুর। ঔপন্যাসিক জনসাধারণের পরিবর্তনটাকে অক্ষয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়।

বালিগঞ্জের অমৃত মজুমদার— পেটি বুর্জোয়া লোকতান্ত্রিক সরকারের (Democratic Government) চরিত্র এই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পুঁজিবাদী জাতীয়বাদী কংগ্রেসী নেতা এই অমৃত মজুমদার তার অভিলাষী স্ত্রীর প্রেরণায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে অবস্থানকারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর আসে অজয় প্রসঙ্গ। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্নে* যে চরিত্রের মিছিল সৃষ্টি করেছেন তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা আছে। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজের বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তাই এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই মনোবিশ্লেষণ প্রয়াসী। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অবস্থান বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। অজয়ের মনোজাগতিক ভাবনা লক্ষণীয় :

> এখন চাকুরে, কেরানী, মাসকাবারী চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ— হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরানো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে আছে জীবন তার চিরদিনের জন্য।

উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই আত্মসমীক্ষণ বা বিশ্লেষণ প্রয়াসী। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে চরিত্রগুলি প্রায় প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। আর এখানেই ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য। তিনি আন্দোলনের বিশালতাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, একের বিষয়কে করে তুলেছেন সকলের। মহৎ বা বড় শিল্পীর পক্ষেই এ ধরনের রচনা সম্ভব। যেখানে কাহিনী বা ঘটনার মূল লক্ষ্য থাকে সমগ্র মানবজীবন এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমাজের সবাইকে আন্দোলিত, আলোড়িত করে। আমাদের আলোচ্য *চিহ্ন* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটিই সার্থকভাবে করেছেন।

কলকাতা-কেন্দ্রিক অবস্থানের তাৎপর্য যে কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আমরা লক্ষ করি ঔপন্যাসিকের মধুখালির ঘটনা বর্ণনায়। গণেশ ও তার বাবা-মা-বোনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রতীকী। উপন্যাসের অন্যান্য এপিসোড যা 'কাট টু কাট' প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তার প্রতিটিই গূঢ় ব্যঞ্জনাধর্মী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো কখনো একটি দৃশ্যের সমস্যাকে অন্য দৃশ্যে নিয়ে গিয়ে তার সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। তাই *চিহ্নের* কাহিনী একটি গভীর ঐক্যে গ্রথিত। এখানকার কোনো দৃশ্যই অপ্রাসঙ্গিক নয় বরং ঔপন্যাসিকের ব্যাপক পরীক্ষা ও প্রতিভাণ শক্তির ফসল।

পদ্মানদীর মাঝি এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা* ছাড়া নান্দনিক শৈলীর দিক থেকে এত সংহত উপন্যাস কেবল *চিহ্নই* আছে। শুধু আছে বললে বোধকরি কম বলা হবে, কেননা 'চিহ্ন'ই তাঁর সবচেয়ে শিল্প সফল উপন্যাস। এর সঙ্গে এ উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্ববীক্ষার নানা পরিবর্তনের সূত্রগুলো। মধ্যবিত্ত বিশেষ করে নিম্নবর্গের সার্থক রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কুশীলব হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতী। তাদের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা, সঙ্কট এবং তার উত্তরণ প্রচেষ্টাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্বিষ্ট। যে-মধ্যবিত্ত সত্তাকে তাঁর একদা পুতুল, নিয়তিতাড়িত মনে হয়েছিল, তাকেই *চিহ্নতে* তিনি বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন— মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারে ঐ সমূহের বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে অন্বিত হয়ে; তার নিজের সংকট-বিচ্ছিন্নতা ও অচরিতার্থতাও এই পথেই কাটবে।১১ জনগণের লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা বাংলা উপন্যাস

শাখায় নতুন বা চিহ্ন এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এ ধরনের অভিনব প্রচেষ্টা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেন :

> বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। ..... এ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি। (৬/৫৬)

এ বক্তব্যের মধ্যে 'টেকনিক' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঔপন্যাসিক এই টেকনিকের বা শৈলীর মাধ্যমেই তাঁর বিষয়কে আবিষ্কার, উদঘাটন ও বিকশিত করেছেন।

চিহ্নর সাহসিক নিরীক্ষা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলব্ধিতে নিয়ে গিয়েছিল যে মধ্যবিত্ত সত্তা বিপর্যস্ত, ভবিষ্যতহীন, নানা কানাগলিতে বদ্ধ। শ্রমনির্ভর সাধারণ মানুষের হাতেই ইতিহাস। চিহ্নতে এই সমাজের এই শ্রেণী-চরিত্র আছে তবে এখানে অক্ষয় ও হেমন্তের চিত্রকল্পে অন্যমাত্রা আসে— এ স্তরের মধ্যেও বেরিয়ে আসার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। আসলে 'চিহ্ন' একটি উত্তরণের উপন্যাস, ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয়দিক থেকেই উত্তরণের স্বপ্ন এ উপন্যাসের শিল্প বাস্তবে প্রত্যক্ষ।

সময়ের ব্যবহার যে কোন উপন্যাসের নন্দনশৈলীর একটি অন্যতম দিক। উপন্যাসে নানাভাবে সময়ের ব্যবহার হয়। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের সময় একরৈখিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একে আমরা জন্ম-মৃত্যু শাসিত সময়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বিশ শতকে আমরা 'endless time' ব্যবহারের একটি ধারা লক্ষ করি যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। এ সময়ে আবার ব্যবহৃত হচ্ছে মস্তিষ্কের সময় যা বিশৃঙ্খল, কুণ্ডলায়িত, উল্লম্ফনধর্মী এবং পারম্পর্যহীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্ন* উপন্যাসে দ্বিতীয় ধারাটির অনুসরণ করেছেন। প্রচলিত সময় ব্যবহারের ধারাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি না ভেঙে উল্লম্ফনধর্মী স্থিতিস্থাপক সময় ব্যবহার করেছেন এ উপন্যাসে। একদিন একরাতের কাল পরিধির মধ্যবর্তী সময়সীমায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে *চিহ্নই* প্রথম। আলোচ্য উপন্যাসের সময় ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে :

ক. চিরবাগী গাঁয়ের নুরুলের রাজহাঁস দু'টির কথা মনে পড়ে যায় রসুলের। (৬/৬৯)

খ. আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠিচার্জ হবে। কপালের ডান দিকে পুরানো ক্ষতের চিহ্নটা চিনচিন করে ওঠে তার। (৬/৬৮)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথমটিতে রসুলের কাহিনীতে প্রথাগত জন্ম মৃত্যুশাসিত সময়ের পরিবর্তে স্মৃতির সময় ব্যবহৃত হয়েছে শৈল্পিকভাবে। দামি পোশাক পরা ইংরেজ সার্জেন্টই রসুলের এই অনুভাবনার উৎস। দ্বিতীয়টিতে বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের সময়কে এক সঙ্গে ধরা হয়েছে।

পূর্বে একথা আমরা উল্লেখ করেছি যে *চিহ্নে* কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র (প্রথাগত নিয়মানুযায়ী) নেই। স্বপ্ন, রেখা, রঙ, স্কেচ ও কোলাজের সাহায্যে অঙ্কিত উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে একসঙ্গে স্থান, সময় ও জনসমুদ্র। উপন্যাসের চরিত্রগুলো এক থেকে অনেকের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। নিজের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে মিশে গেছে বিশাল জনসমুদ্রে। এই বিশাল জনসমুদ্রের ভাব, আবেগ, ভাবাবেগ ও চিন্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করার দুরূহ কাজটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। আর এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন উপন্যাসটির নির্মাণ প্রক্রিয়ায়। ফলে 'চিহ্ন' তাঁর শিল্প সাফল্যের চূড়াস্পর্শী উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

চিহ্ন উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচর্যারীতির নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ছাড়াও *চিহ্নে* বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লম্ফন রীতিতে বিন্যস্ত হয়েছে নানা ঘটনা। যেমন— পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হবার মুহূর্তে গণেশ শৈশবের স্মৃতির জগতে অবগাহন করে;

> তা ছাড়া, মনে তার তীব্র অসন্তোষ, গভীর কৌতূহল। এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে। কত পূর্ণিমা তিথিতে অনেক রাতে সে চুপিচুপি ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা-বাবাকে না জাগিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকেছে ভাটার মরা নদীর ধারে কোটালের জোয়ারের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের জন্য। (৬/৫৭)

— এ জোয়ার গণেশ মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে না পারলেও তার পরিবার এবং সঙ্গী-সাথীরা পরে তা প্রত্যক্ষ করেছে।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার বক্তৃতা শুনে হেমন্ত স্মৃতির জগতে চলে যায়। বর্তমান ঘটনাকে রেখে তার মাকে নিয়ে গড়ে ওঠে স্মৃতিজড়িত একটি উপাখ্যান :

> মাকে মনে পড়ে হেমন্তের। সীতাকেও। এইখানে এভাবে তাকে পুলিশের লাঠি ও গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বসে থাকতে দেখলে মার মুখের ভাব কিরকম হত ভাবতে গিয়ে কল্পনায় যেন কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় না মা'র মুখখানা, বড় বড় চোখের আতঙ্ক-বিহ্বলতার আড়ালে মুখের বাকি অংশ ঝাপসা হয়ে থাকে।' (৬/৬১)

— অতঃপর এ অংশেই সিগারেট খাওয়া নিয়ে মা ও ছেলের মান-অভিমান ও আবেগঘনিষ্ঠ উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে।

রসুলের হাতে গুলি লাগার ফলে সে আহত হয়, এই আহত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও তার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর আঘাতের ঘটনা স্মরণে আসে।

চিহ্ন উপন্যাসে বিশেষভাবে ব্যবহৃত পরিচর্যারীতিগুলো হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক, চিত্রাত্মক, নাটকীয়, সংলাপধর্মী, দৃশ্যবন্ধ, প্রতীকী ও চিত্রকল্পাত্মক এবং ইম্প্রেশনিস্টিক। এ ছাড়াও পরাবাস্তব চেতনারও আংশিক প্রকাশ এ উপন্যাসের সংগঠনরীতিতে লক্ষ করা যায়। নিম্নে *চিহ্নে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর্যুক্ত পরিচর্যারীতি ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হল। শুধু বর্ণনা না করে, মাঝে মাঝে প্রতিটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে। ঘটনার কার্যকারণকেও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দু'টিরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। *চিহ্ন* উপন্যাসে এ বিশ্লেষণ বহুবার এসেছে। অক্ষয় চরিত্রের রূপ-রূপান্তরও তিনি এ পদ্ধতিতেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি নিম্নোক্ত অংশটি :

> বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। চাদরটা অক্ষয় ভাল করে গায়ে জড়িয়ে। এই ঠাণ্ডায় ওরা কি সারা রাত রাস্তায় বসে থাকবে? শীতে জমে যাবে না? একটা জোরালো স্নায়বিক শিহরণ বয়ে যায় অক্ষয়ের সর্বাঙ্গে, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেরাস্তার মস্ত মোড়ে, আলো সেখানে ঝলমল করছে বিশেষ ব্যবস্থায়। মাথাটায় কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে নেয়। তিন-চার বছর আগে হলেও সেও বোধ হয় পারত গুলির মুখে নির্বিবাদে রাস্তায় বসে থাকতে, সারা রাত ধরে শীতে জমতে। চাকরী নিয়েও বেশ কিছু কাল, যুদ্ধের বাজারে উপরি আয়ের উপায়টা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে তার। (৬/৭৪)

অক্ষয়ের অতীত এবং বর্তমানকে এখানে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু অবস্থার দাবি মেটাতে কিংবা প্রতিবেশ-পরিস্থিতিতে অক্ষয় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার মনোজগতের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে এ সবই ঔপন্যাসিক এঁকেছেন বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে। তবে সে বিশ্লেষণ দীর্ঘ নয় বরং তা সংক্ষিপ্ত এবং সূক্ষ্ম।

চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতি (Pictorial Treatment) *চিহ্ন* উপন্যাসের নন্দনশৈলীর একটি অন্যতম দিক। এ প্রক্রিয়ায় ঔপন্যাসিক তাঁর দেখাকে ছবির মতো করে উপস্থাপন করেন। পাঠক সব কিছুকে চক্ষু-লেন্সের (ক্যামেরা) মধ্য দিয়ে

দেখতে পারে। *চিহ্ন*তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। একটি সংগ্রামের, প্রতিরোধের বা অবস্থানের ছবি এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করেছেন, আর তা তিনি করেছেন ছবির পর ছবি অঙ্কনের মধ্য দিয়েই। আর এ ছবি ঔপন্যাসিক এমনভাবে অঙ্কন করেছেন মনে হয় তিনি যেন একটি চলমান ক্যামেরার সাহায্যে ঐ সংগ্রামের নানা টুকরো চিত্র ধারণ করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। ছবিগুলোর উপস্থাপনভঙ্গি দেখে তা সরাসরি সম্প্রচারের সঙ্গেও তুলনা করা যায় অর্থাৎ সংগ্রামের নানা ছবি ঔপন্যাসিক যেখানে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনিভাবেই এঁকেছেন। এই চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতির ব্যবহার *চিহ্ন*-র নন্দনশৈলীকে বিশিষ্টতা দান করেছে। *চিহ্নে*র সর্বত্রই চিত্রাত্মক রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

ক. খবরের কাগজে পরদিন সভার খবর পাওয়া যাবে— এ কথা জানা সত্ত্বেও হেমন্ত চলে যেতে পারেনি। প্রতিবেশ তাকে আটকে দিয়েছে। ঔপন্যাসিক সে প্রতিবেশ এঁকেছেন চিত্রাত্মক (পিক্টোরিয়াল) রীতিতে :

> প্রদীপ্ত মুখগুলি; নির্ভীক চোখগুলি, আশেপাশের ছাড়া-কথা ও আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি আর অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে। (৬/৬০-৬১)

খ. উনিশ-টি উপাখ্যান (এপিসোড) এ উপন্যাসে এসেছে। আর এগুলো সবই এসেছে চিত্রাত্মক পরিচর্যারীতির আশ্রয়ে।

চিহ্ন উপন্যাসটি শুরু হয়েছে নাট্যিক (Dramatic) আবহের মধ্য দিয়ে ('প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের'— এ জাতীয় সংলাপে)। তারপর উপন্যাসের কাহিনী যত অগ্রসর হয়েছে ঔপন্যাসিকের নাট্যিক পরিচর্যারীতি (Dramatic Treatment) ব্যবহারও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যদিনের অভ্যাস অকস্মাৎ বড় কোনো ঘটনার প্রভাবে পরিবর্তিত হলে সে মানুষগুলোর বহির্জগত ও অন্তর্জগতের পরিবর্তনগুলো কীভাবে ঘটে তারই নাট্যিক প্রকাশ আছে *চিহ্ন* উপন্যাসে। প্রতি রাতে যে অক্ষয় মধ্যপান করে ঘরে ফিরে স্ত্রী অলকার (সুধা) সঙ্গে মাতলামি করে সে যখন লড়াই-সংগ্রাম ও অবস্থানের চিত্র দেখে সত্যি সত্যি মদ পান না করে বাসায় এসে স্ত্রীকে তা বোঝাতে যায় তখন তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলের চিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যিক কৌশলরীতিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

ক. 'সুধাই বাইরের দরজা খুলে দেয় প্রতি রাতের মত। মুখ খুলে ব্যথিত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আজ আর তাকায় না অন্য দিনের মত, পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে মাথা হেট করে থাকে!

অক্ষয় উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই?'

'কি জানি। চেঁচামেচি জুড়ো না।'

'তোমার হল কি?'

সুধা জবাব দেয় না। মাথাও সে হেঁট করেই রাখে। অক্ষয় চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে এলে নিঃশব্দে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়! অক্ষয়ের অনুভূতি হয় দু'রকম। তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপরি উপলব্ধি করতে পেরেছে। (৬/১০৭)

খ. 'মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধা?'

'কি জানি।'

'বোসো! এখুনি আসছি।'

'কোথা যাবে?' সুধা আর্তনাদ চেপে বলে।

'মাকে প্রণাম করে আসি।'

পায়ে পড়ি তোমার, রাত দুপুরে কেলেঙ্কারি কোরো না। মা ঘুমুচ্ছেন।' অক্ষয় বলে, 'আরে! কি করছ তুমি! এত রাতে ফিরে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি কেন বুঝতে পারছ না? আজ খেয়ে আসিনি। মা খুসী হবেন শুনে। (৬/১০৮)

সর্বপ্রকার বাহুল্যকে *চিহ্ন* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্জন করেছেন। তাই এত বিশাল পটভূমি ও চরিত্রের মিছিল সত্ত্বেও উপন্যাসখানি স্বল্পায়তনিক এবং এর মধ্যেই সমস্ত বক্তব্য ও আবেগকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আসলে ঔপন্যাসিকের পরিচর্যারীতির কৌশল প্রয়োগই এ সাফল্যের পেছনের কারণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্নতে* সংলাপরীতির আশ্রয় নিয়েছেন যা তাঁর অনেক বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। এক, দুই, তিন বা চারজন বক্তাও একই সঙ্গে ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে *চিহ্নে*, ফলে আয়তন দীর্ঘ না হয়েও উপন্যাসের বক্তব্যের গভীরতা ও বিশ্লেষণধর্মিতার পরিধি ব্যাপক হয়েছে। প্রচলিত দু'টি চরিত্রের সংলাপরীতিকে ভেঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্নে* নব রীতির প্রয়োগ করেছেন যেখানে একই সঙ্গে দুইয়ের অধিক চরিত্র কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে। শিবনাথ, রসুল ও ওসমানের কথোপকথনে ঔপন্যাসিক কর্তৃক সংলাপরীতির এ নব মাত্রার প্রয়োগ প্রশংসার দাবি রাখে :

'শিবনাথ চিনতে পেরে প্রথমে বলে, 'আপনি এখানে?'
রসুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'এখন হাসপাতালে কি করছেন সাব?
আপনার কেউ কি— ?'
'একটি ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম। মাথায় গুলি লেগেছিল,
মারা গেছে।'
ওসমান একটু ইতস্তত করে যোগ দেয়, 'আমার কেউ নয়।'
পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ— '
'বাড়ী যেতে মুস্কিল হবে।'
'পা আছে।'
'তা আছে বটে।'
রসুলের হাতে কি হয়েছে সব যেন জানে ওসমান এমনি ভাবে জিগ্যেস করে, 'হাতটা বাঁচবে তো?'
'কি জানি। সন্দেহ আছে।'
"ইস! ডান হাত।' (৬/৯০-৯১)

চিহ্ন উপন্যাসে উনিশটি দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই একাধিক চরিত্র উপস্থিত। সেখানে তারা নিজেদের উচ্চারণ ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করছে বিভিন্ন সংলাপ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। এ জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দৃশ্যাত্মক পরিচর্যারীতির (Scenic Treatment) আশ্রয় নিয়েছেন। উপন্যাসের তৃতীয় দৃশ্যের পুরোটাই (নারায়ণ-রজত-শান্তি) এ পদ্ধতির সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

কখনো কখনো বিশ্লেষণ নয়, চিত্রাত্মক নয়, প্রতীকী সংক্ষিপ্ত তথা মেধাবী ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয়কে প্রকাশ করেছেন। আর এ পদ্ধতি প্রতীকী পরিচর্যারীতি (Symbolic Treatment) হিসাবে পরিচিত। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *চিহ্নে* উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপক বা প্রতীক ব্যবহারে বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। যে চরিত্রের সাপেক্ষে তিনি উপমাদি প্রয়োগ করেছেন, সেগুলো তিনি আহরণ ও নির্বাচন করেছেন সেই চরিত্রের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। নদী-তীরবর্তী এলাকার ছেলে গণেশের মিছিল সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? (৬/৫৭)

রজতের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে নেয়া উপমাও লক্ষ করার মতো :

কি সুন্দর ঘোড়াগুলি! তালে তালে পা ফেলছে আর মাসেলগুলিতে যেন ঢেউ খেলছে নেচে নেচে। (৬/৬৫)

উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক প্রতীকের পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে বা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য মিথের বা পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মূলত ভারতীয় পুরাণ ব্যবহার করেছেন। ব্যবহৃত কয়েকটি পুরাণের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা হলো :

১. এইটুকু ছেলে যদি এমন করে বলতে পারে এসব কথা, শক্তিপুত্র পরাশর যে মায়ের গর্বে থেকেই বেদধ্বনি করে পিতামহ বশিষ্ঠের আত্মহত্যা নিবারণ করবে সে আর এমন কি আশ্চর্য কাহিনী! (৬/৬৬)

২. এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনিভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। (৬/৫৭)

৩. 'গাঁ সুদ্ধ লোক যে হৈহৈ করে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে রাবণের হাত থেকে তা কি সে জানত! (৬/৮৬)

চিহ্ন উপন্যাসের মূল থিমটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ চিত্রকল্পে ধারণ করেছেন। এছাড়াও তিনি চিত্রকল্পাত্মক পরিচর্যারীতির (Imagistic Treatment) আশ্রয়ে একাধিক দৃশ্য রচনা করেছেন। এ রীতির প্রয়োগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সাবলীলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসটির মূল সুর বা জনতার জোয়ারকে ঔপন্যাসিক যে চিত্রকল্পে ধারণ করেছেন তা উদ্ধৃত করছি :

> সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে, গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে শহরের পথে সে- জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাতে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।' (৬/৫৭)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসের একটি শব্দও অতিরিক্ত নয়। এর কাহিনী অভিনব, গদ্য ব্যঞ্জনাময়, আবেগময়, সুরবহুল এর ভাষা, যা সরাসরি ঘটনার কেন্দ্রে প্রবেশের মত :

'প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশর'— বাক্যকে ভেঙে কর্তাকে কর্মের উপর স্থাপন করেছেন। ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বাক্যের ব্যবহারের প্রাচুর্য *চিহ্ন* উপন্যাসকে অলঙ্কৃত করেছেন। যেমন :

ক. গণেশকে ভিড়ের অর্থ বোঝাতে – 'সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে।'

খ. গীতময় বর্ণনা– 'এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না।'

চিহ্নর রচনায় ঔপন্যাসিক ভাষাকে প্রদান করেছেন বহুমাত্রিকতা, শব্দকে করে তুলেছেন অব্যর্থ ও অনির্বচনীয়। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যাধুনিক

শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যও *চিহ্নে* প্রয়োগ করেছেন। বহির্জগতের চাপে যাদবের অন্তর্জগতের সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে। রং, আকার অবয়ব সবই পরিবর্তিত হচ্ছে। পরাবাস্তবধর্মী পরিচর্যারীতির (Surrealistic Treatment) সাহায্যে ঔপন্যাসিক যাদবের মনোভাবকে উদ্ভাসিত করেছেন উপন্যাস-অন্তে এভাবে :

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দু'টি চোখ জ্বল জ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে। (৬/১৩৪)

রাজপথের বিদ্রোহ সংঘটিত হবার ছ'মাসের মধ্যেই *চিহ্ন* উপন্যাসের রচনা শুরু হয় এবং মাত্র ন'মাসের মধ্যেই এটি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতবর্ষে যে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়েছিল, *চিহ্ন* উপন্যাস রচনাকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সে বিষয়টি ছিল উজ্জ্বল। প্রতীকী পরিচর্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের দার্শনিকতা বোধ নিম্নোক্তভাবে পরিস্ফুটিত :

দু'জনেরি পরনে পাজামা। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় খুলে খানিকটা ছিড়ে নেয়, পকেটের রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতমুখে চেপে বসিয়ে জোরে কাপড় জড়িয়ে বাঁধতে থাকে।' (৬/৭১)

চিহ্নের বিভিন্ন চরিত্রের পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিরাবেগে শৈল্পিক স্কেচে অঙ্কিত হয়েছে। যেমন— রসুল ও আমিনার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ। ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হলেও পিতৃহারা, মাতার একমাত্র সন্তান রসুলের বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ থাকে না। হাসপাতালের শয্যায় রসুল মাতৃ আদরের জন্য বুভুক্ষু হয়ে গ্রেপ্তারকৃত অবস্থায় পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে মায়ের কাছে যায়। গ্রেপ্তারকৃত অন্যদের সাথে একাত্মবোধ, সাহস ও সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের প্রশান্তি আমিনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। (৬/১০৬)

অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে উদ্ভাসিত রসুলের মাতার অনুভাবনা মূলত দেশমাতৃকার ভাবনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি এই অন্তর্বেদনা ও চাপাক্ষোভ ধারণ করেই আবেগী ও গীতময়।

অত্যন্ত সংক্ষেপে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে *চিহ্ন* উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। অল্প কথায় জীবনের বৈচিত্র্য, বিদ্রোহ, নানা অনুভূতি ঔপন্যাসিক এখানে প্রকাশ করেছেন নান্দনিক সৌকর্য্যের সঙ্গে। এগুলোর পাশাপাশি মানবীয় বোধগুলোও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সমান মূল্য পেয়েছে। এ উপন্যাসে যেরকম সংক্ষিপ্ত সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে তা অন্যত্র দুর্লভ। যেমন :

ওর মার কথা কিছু বোলো না। শুধু বোলো আমি টেলিফোন করেছিলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে বলেছি। (৬/৯৮)

এই সংলাপ সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহজাত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যঙ্গ যুক্ত হয়ে উপন্যাসের সংলাপগুলোকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে :

মায়ের মতই হয়ে উঠেছে মেয়েটা। স্বামী পায়নি এখনো, বাপের ওপরেই কথার ঝাল ঝাড়ে। (৬/৭৯)

কখনো কখনো আবার ঔপন্যাসিক দীর্ঘ বাক্যও নির্মাণ করেছেন :

আগে যখন আরও সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এসব ব্যবস্থা এরকম করে করা যাবে মরে বেঁচে এ ভরসা করা চলত, তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলোচুলি কাঁদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে— এখন আরও শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা হারিয়ে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে গিয়েও সবাই যেন জীয়ন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে— ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের (৬/১২৬)

— এ রকম একটি দীর্ঘ বাক্যে স্কেচের মতো করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের অতীত বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছু নিখুঁতভাবে এঁকে দিলেন।

রাজনীতির কথাই এ উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি। সমসাময়িক জনপ্রিয় শ্লোগানগুলোকেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি এ উপন্যাসে তুলে এনেছেন। যেমন– 'জয় হিন্দ!' ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক,' 'বন্দে মাতবম' প্রভৃতি। কোনো কোনো চরিত্র সরাসরি স্বাধীনতাও দাবি (অশোক বলেছিল, 'তাছাড়া আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি?') করেছে। এসব ভাবনা ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক বোধ থেকে উৎসারিত। নেতা কখনো জনগণকে জাগাতে পারে না। জনগণ নেতা তৈরি করে, তবে তারা একে অপরের পরিপূরক। চিহ্নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথাই বলতে চেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাকে সহজ, সরল বর্ণনায় চিত্রাত্মক করে প্রকাশ করেছেন। হাজার হাজার মানুষের বৈচিত্র্য বোঝাতে বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ এখানে ঘটেছে সত্য কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো ছিটকে যায়নি ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রীয় সঙ্কটের সঙ্গে সন্নিহিত করার দক্ষতার কারণে। এ সম্মিলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সময় ও স্থানের ঐক্যের সঙ্গে সবকিছু মিলিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষের বাইরের জগৎ ও অন্তর্জগতের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি :

ক. মরা মানুষ যেন বেঁচে উঠে তাকিয়ে আছে বিহ্বলের মতো। (৬/৫৮)

খ. এগোবার কল টিপলেই এগোবে। (৬/২৮)

গ. ... কারণ ফেনিল গ্লাস চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীবন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে– গেঁজানো রক্ত। (৬/১০৮)

ঘ. একদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে তাদের গাঁয়ের পাশের নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলেও বোধ হয় এমন তাজ্জব লাগত না তার। (৬/১২৮)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিচতুষ্টয়ের প্রতিটিই বহির্জগতের চাপে ভেঙ্গে যাওয়া অন্তর্জগত থেকে জাত ভাবনার প্রতিফলন যা বহির্জগত ও অন্তর্জগত দু'টিকেই একত্রে ধারণ করেছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি জাতির পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠার ইতিহাস হচ্ছে চিহ্ন। মানুষের চেতনার অকস্মাৎ জাগরণ এবং এ জাগরণ থেকেই সবার জেগে উঠাই চিহ্নের মূল কথা। নন্দনতাত্ত্বিক নানা বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস *চিহ্ন* যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার চূড়া স্পর্শ করেছে। সর্বভারতীয় সঙ্ঘশক্তির ঐক্যবদ্ধ জাগরণে উপন্যাসের সমাপ্তি। যে ক্রান্তীয় প্রশ্নকে সামনে রেখে এ উপন্যাসের শুরু :

'এরা এগোবে না বাবু?' (প্রশ্নটি সমগ্র উপন্যাসে ৭ বার এসেছে এবং 'এগোবে' শব্দটি এসেছে ৮ বার আর 'এগিয়েছি' ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।)।

তার প্রত্যয়দীপ্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে– 'আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।'

— এ উপন্যাসের সমাপ্তি। জ্যামিতিক প্রমাণের মতোই উপন্যাসটির মূল জিজ্ঞাসা পরিশেষে উত্তর খুঁজে পেয়েছে নান্দনিক দ্যোতনায়।

তথ্যনির্দেশ

১. চিহ্ন উপন্যাসের পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচকের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

(ক) গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসের ভূমিকায় মানিক নিজেই বলেন: 'চিহ্ন বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।'

(দ্র : *মানিক বিচিত্রা*, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা: ১৯৭১, পৃ. ৩১: কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, সরোজমোহন মিত্র, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ. ৬৮

(খ) "গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।" *মানিক গ্রন্থাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি: কলকাতা, বিশেষ সং ১৯৭৪, গ্রন্থ পরিচয় অংশ), পৃ. ৬৫৩

(গ) "গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে (মাঘ ১৩৭৮) 'চিহ্ন'-র পরিচয় লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে যে উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। তাহলে উপন্যাসটিকে মাঘ ১৩৫২ থেকে পৌষ ১৩৫৩র মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ 'চিহ্ন' নেই।" (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ফ্রয়েড থেকে মার্কস, জলার্ক,* কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৯৩-৯৪-এ বক্তব্য সরোজ দত্তের)

(ঘ) "১৯৪৬ সনে রসিদ আলি দিবসের প্রেক্ষাপটে ঐ বছরের 'বসুমতী'র নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় *চিহ্ন* (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ফ্রয়েড থেকে মার্কস, জলার্ক* কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৩০-এ বক্তব্য মালিনী ভট্টাচার্যের)

২. সৈয়দ আজিজুল হক, "চিহ্ন এবং ঝড় ও ঝরাপাতা", *সাহিত্য পত্রিকা,* পঁয়ত্রিশ বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৯২, পৃ. ১২৪-১২৬

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৬

৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ-অসমাপ্ত বিপ্লব,* কলকাতা; ১৯৮৯, পৃ. ৭২ (দ্র: পূর্বোক্ত পৃ. ১২৪-১২৬)

৫. *মানিক গ্রন্থাবলী,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯শে মে, ১৯৮২) পৃ. ৬৬

৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরে তাঁর 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসকে 'কালবৈশাখী' নাম দিয়ে জুন, ১৭৬৩ সালে প্রকাশ করেন। দ্র: *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড, (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯২ কলকাতা, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পৃ. ৩১৯)

৭. অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী, *'শিল্পে বাস্তবতা', মাসিক মোহাম্মদী,* ২৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, পৃ. ১৫৩

৮. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭) পৃ. ৬৯

৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা, দেজ সংস্করণ, ১৯৮০) পৃ. ১৩-১৪

১০. দ্রষ্টব্য : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েড থেকে মার্কস* (কলকাতা, জলার্ক ১৩৯৭) পৃ. ৫৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।